কালের কণ্ঠ

তারিখ 15 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

অযোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ দিলে শিক্ষার মান থাকে না

গোলাম কবির

কিছুদিন আগে কালের কণ্ঠ'র প্রথম পাতার সূচনায় 'শিক্ষার মানে ধস মাধ্যমিক থেকে' শিরোনামের প্রতিবেদনটি পড়লাম। বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ অবক্ষয়ের চিত্র প্রায় দুই দশকেরও আগে শুরু হয়েছে। এখন সেটা প্রকট ও ভয়াবহ।

১৯৬২ সাল থেকে মাঝে বিরতিসহ ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আমি শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। তখন সরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছড়াছড়ি এখনকার মতো ছিল না। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি তহবিল থেকে শিক্ষকদের সামান্য মাগগী ভাতা (d.a) দেওয়া হতো এবং কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্ধারিতভাবে অনুদান পেত। অর্ধশতাব্দীর কিছু আগে এ অঞ্চলে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতেন এবং শিক্ষানুরাগী মানুষের অনুদান আর শিক্ষার্থীদের সামান্য বেতন দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভালোভাবেই চলত। সত্যিকারে যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের নিয়োগের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ তো করতই না, বরং ভালো শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অলিখিত প্রতিযোগিতা চলত।

বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সমপরিমাণ বেতন দেওয়া প্রবর্তিত হলে বেকার সনদধারীরা ঘরে ঘরে স্কুল-কলেজ খোলা শুরু করল। সমসাময়িক সরকার জাতির ভবিষ্যতের কথা না ভেবে জনপ্রিয়তা লাভের জন্য সেসব নামসর্বস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আওতায় নিয়ে আসে।

প্রথম দিকে শিক্ষক নিয়োগের সময় শিক্ষা ভবনের সংশ্লিষ্টদের সালামির কথা বলে প্রার্থীর কাছ থেকে অনুদান নেওয়া হতো। নিয়োগপ্রক্রিয়ায় যুক্ত এক্সপার্টরাও তেমন পারিতোষিক নিতেন না। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ভবনের সালামির পরিমাণ ও এক্সপার্টদের চাহিদাও বেড়ে গেল। উপরন্তু পরিচালনা পরিষদের সভাপতিদের খুশি করতে একজন প্রার্থীকে নিদেনপক্ষে ১০ লাখ টাকা গুনতে হয়। টাকার জোগান দিতে পারাটাই প্রার্থীর সেরা যোগ্যতা। ফলে অপেক্ষাকৃত মেধাবীরা হাহুতাশ করে, আর শিক্ষিত হওয়ার জন্য নিজেদের অভিশপ্ত ভাবতে থাকে।

প্রতিবেদক শরীফুল আলম সুমন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। করলে শিক্ষক নিয়োগসংক্রান্ত দেশের সামগ্রিক চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করতাম।

বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াটি মাধ্যমিকের মতোই। তবে এখানে টাকার অঙ্ক আরো বেশি। শোনা যায় তথাকথিত অনুদান ১৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এগুলো দেখার মা-বাপ নেই। যেসব সরকারি কর্মকর্তা নিরীক্ষার জন্য আসেন তাঁরা নগদনারায়ণ পেলে কোনো কিছু তলিয়ে দেখেন না। অনেক সময় ঢাকায় গিয়ে সালামি দিয়ে এলে সব ঠিকঠাক হয়ে যায়।

এবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। স্বাধীনতার সুফল প্রাপ্তির মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে, স্বায়ত্তশাসনের ফলে তার সদ্ব্যবহার কতটুকু হয় তা বোধ করি অনেকের জানা। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা নাই বা বললাম, তবে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি না উল্লেখ করলে জাতীয় সর্বনাশের ফিরিস্তি পূর্ণ হবে না। সবার জানা কর্মসংস্থানের অপেক্ষাকৃত সহজ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য তুলনামূলকভাবে বিজ্ঞানের অধিকাংশ মেধাবী শিক্ষার্থী ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে যারা সুযোগ পায় না তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। অবশ্য এখানেও কিছুসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী থাকে। তারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তি হয়। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার সুযোগ না পেয়ে অথবা নিজের পছন্দের জন্য সমাজবিজ্ঞান, বাণিজ্য এমনকি কলা অনুষদেও ভর্তি হয়। ফলে তারাই সেরা মেধাবী হিসেবে প্রথম শ্রেণি পেয়ে যায়। প্রসঙ্গত, কলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের কথা বলতে হয়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তারা অপেক্ষাকৃত কিছুটা দুর্বল। তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেই হয়। তাদের মধ্যে মেধাবীরা প্রথম শ্রেণি পেয়ে যায়। সব অনুষদের যারা প্রথম শ্রেণি পায় তাদের প্রথম লক্ষ্য থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার জন্য। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়া দলমত-আত্মীয়নিরপেক্ষ নয়। প্রার্থীদের দলভুক্ত, না হয় শিক্ষকের সন্তানাদি হতে হয়। এসব ভাগ্যবান প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষকের পাণ্ডিত্য নিয়ে আমজনতা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। কেবল তা-ই নয়, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখান থেকে পিএইচডি, এমফিল ইত্যাদি ডিগ্রি দেওয়া হয়, তার নির্দেশাবলিতে একাধিক বানান ভুল। অনুমান করা কঠিন নয়, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোন শিক্ষা দেন। কিছুসংখ্যক ভালো শিক্ষক নেই তা বলা যাবে না। তবে দলবাজদের কাছে তারা নগণ্য। আমার বিশ্বাস, যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে দেশের সম্মানজনক প্রথম শ্রেণির চাকরিতে প্রবেশ করে তারা প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় স্বশিক্ষিত। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এই যে নৈরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা আবশ্যক। অন্যথায় সরকারের প্রথম শ্রেণির উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ ধার করে আনতে হবে।

আমাদের অনেকের স্মরণ থাকার কথা, বঙ্গবন্ধু মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া অবৈতনিক করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, যথার্থ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে। তিনি করতেনও। যেমন করেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। তিনি পরের স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ঢালাও জাতীয়করণের পক্ষপাতী ছিলেন না। আমরা দেখেছি, স্বাধীনতার পর বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা কয়েক মাস লাগাতার কর্মবিরতি পালন করেন। বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা না করে জাতীয়করণ করলে আত্মঘাতী হবে। বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বোধ করি বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙিয়ে যাঁরা কর্তৃত্ব করছেন তাঁরা বেমালুম বিস্মৃত। জাতির মৌলিক চাহিদার মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। তা কোনোক্রমেই গোঁজামিল দিয়ে চলে না। আমরা 'যার কাজ তার সাজে' প্রবাদটি ভুলে গেছি বলে সেবার মোড়কে রাজনীতির আশ্রয় নিয়ে জাতিকে শিক্ষাশূন্যতার দিকে নিক্ষেপ করছি। এই মহামারি রোধ করা গেলে শিক্ষকরা মহিমান্বিত হবেন। যেমন বঙ্গবন্ধু তাঁর শিক্ষক দার্শনিক সাইদুর রহমানকে বঙ্গভবনে নিজের চেয়ারে বসিয়ে শিক্ষকের যথার্থ মূল্য দিয়েছিলেন।

লেখক : রাজশাহী কলেজের সাবেক শিক্ষক